আর্থিক অপরাধ তদন্ত

ও পাচারকৃত অর্থ পুনরুদ্ধার

মো: মাসুদ রানা

শব্দাবলি

শব্দাবলি

আর্থিক অপরাধ তদন্ত ও পাচারকৃত অর্থ পুনরুদ্ধার
মো: মাসুদ রানা

© লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ
মে ২০২৫

প্রকাশক
শব্দাবলি প্রকাশন
৫/১, শিরিশ দাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯৭০-১২১২৮৬
shabdabolibd@gmail.com
shabdaboli.com
fb.com/shabdabolibd

প্রচ্ছদ
আবুল ফাতাহ

অনলাইন পরিবেশক
boisodai.com, rokomari.com, wafilife.com,
pbs.com.bd, prothoma.com, ejanani.com

মূল্য: ১০০০.০০ টাকা

Financial Crime Investigation & Stolen Asset Recovery, Md. Masud Rana
First published in May 2025, Published by Shabdaboli
5/1, Shirish Das Lane, Banglabazar, Dhaka-1100
Price: BDT 1000.00, USD: 10.00
ISBN: 978-984-98601-1-2

ভূমিকা

'আর্থিক বা মানি লন্ডারিং অপরাধ তদন্ত' বা 'ফলো দ্য মানি' বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বিশ্বের বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা প্র্যাকটিস করা আরম্ভ করলেও মূলত: ১৯৮৯ সালে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্কফোর্স এর ৪০ সুপারিশ প্রণয়নের পর এ ধরনের তদন্ত কার্যক্রম একটি গতি লাভ করে। পরবর্তীতে ২০০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনার তদন্তে মূলত আর্থিক তদন্তের মাধ্যমে সন্ত্রাসী ও সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের মাঝে যোগসূত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে আর্থিক বা মানি লন্ডারিং অপরাধ তদন্ত আরো অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আর্থিক ও অন্যান্য বিভিন্ন প্রকার অপরাধ তদন্তের জন্য একজন তদন্তকারীর বিভিন্ন প্রকার দক্ষতার প্রয়োজন হয়। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো অপরাধের মানি ট্রেইল বা অর্থের গতিপথ খুঁজে বের করা এবং উক্ত মানি ট্রেইলের সাহায্যে অপরাধের বিষয়ে অপরাধীর যে জ্ঞান ছিল বা অপরাধী যে জ্ঞানতঃ অপরাধ সংঘটন করেছে তা প্রমাণ করা। এছাড়াও আর্থিক অপরাধ তদন্তে আর্থিক ব্যবস্থার সম্যক জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। সাক্ষী ও সন্দেহভাজনকে জিজ্ঞাসাবাদ এমনি একটি স্বতন্ত্র দক্ষতা। জবানবন্দি গ্রহণ সাক্ষ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়ার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং এটি সফলভাবে সম্পাদন করতে হলে আর্থিক তদন্তকারীকে সঠিক প্রশ্নটি সঠিকভাবে উপস্থাপন করার কৌশল অর্জন করতে হবে।

অবৈধ আয়ের হিসাবায়ন একটি জটিল পদ্ধতি বিধায় একজন তদন্তকারীর সঠিক ও সহজভাবে উপস্থাপনযোগ্য অবৈধ আয়ের হিসাবায়ন করার কৌশল জানাটাও অত্যন্ত জরুরি। একটি ছবি এক হাজার শব্দের সমান। আর্থিক অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে লিংকিং, চার্টিং কেসকে সহজবোধ্য করে তোলে। আর্থিক অপরাধ তদন্তে প্রায়শই অর্থের চলাচল দেশ ছাড়িয়ে বিদেশে বিস্তৃত হয়ে থাকে। বিদেশ হতে উক্ত তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ এবং উক্ত পাচারকৃত অর্থের পুনরুদ্ধার আর্থিক অপরাধ তদন্তের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এজন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বিভিন্ন মাধ্যম ও আইনি বিষয়গুলো জানা একজন তদন্তকারীর জন্য খুবই জরুরি।

উপরোক্ত সার্বিক বিষয়াদি মাথায় রেখে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় রচিত "আর্থিক অপরাধ তদন্ত ও পাচারকৃত অর্থ পুনরুদ্ধার" বইটিতে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে কাজ করার দীর্ঘ দেড় যুগের অভিজ্ঞতার সবটুকু কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি। এই বইটি বাংলাদেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার আর্থিক বা মানি লন্ডারিং

অপরাধ তদন্তে নিয়োজিত অনুসন্ধানকারী ও তদন্তকারী কর্মকর্তাদের জন্য যথেষ্ট উপযোগী হবে মর্মে আমার বিশ্বাস।

এই বইটি রচনার ক্ষেত্রে যত্ন করে বইটির কনটেন্ট বিশেষত: আর্থিক তদন্তের অংশটি রিভিউ করে দেয়ার জন্য জনাব গোলাম শাহরিয়ার চৌধুরী, পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন এর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমি আরো কৃতজ্ঞ জনাব রায়হান উদ্দিন খান, অতিরিক্ত ডিআইজি, পুলিশ হেডকোয়াটার্স, জনাব বাছির উদ্দিন, অতিরিক্ত ডিআইজি, সিআইডি এবং জনাব মুহাম্মদ মিনহাজুল ইসলাম, স্পেশাল সুপারিনটেন্ড, সিআইডি, বাংলাদেশ পুলিশ, যারা বিভিন্ন সময়ে আমাকে সময় ও জ্ঞান দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। আমি আরো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার এক সময়ের সহকর্মী বিএফআইইউ এর সহকারী পরিচালক জনাব আবদুল মোতালিব ও অফিসার জনাব কাজী মো: জাফরুজ্জামান, যারা এই বইটি রচনায় আমাকে সহযোগিতা করেছেন। এছাড়াও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি প্রকাশক 'শব্দাবলি প্রকাশন' এর প্রতি যারা আগ্রহ করে এই বইটি প্রকাশের জন্য এগিয়ে এসেছেন এবং জনাব আবুল ফাতাহ যিনি বইটির জন্য একটি সুন্দর প্রচ্ছদ ডিজাইন করে দিয়েছেন। সর্বোপরি আমি কৃতজ্ঞ মহান আল্লাহর কাছে যিনি আমাকে বই সম্পন্ন করার তৌফিক দিয়েছেন এবং অবশ্যই আমার পরিবারের সদস্যদের প্রতি।

আমি আশা করছি, এই বইটি বাংলাদেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার (বিশেষত: বাংলাদেশ পুলিশ, দুর্নীতি দমন কমিশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর) আর্থিক বা মানি লন্ডারিং অপরাধ তদন্তে নিয়োজিত অনুসন্ধানকারী ও তদন্তকারী কর্মকর্তাদের পরিচালিত দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

সূচীপত্র

০১ আর্থিক অপরাধ ১১

১.১ ভুমিকা ১১
১.২ আর্থিক অপরাধ ১২
১.৩ মানি লন্ডারিং অপরাধ ১৩
১.৪ সম্পৃক্ত অপরাধ ১৫
১.৫ আর্থিক অপরাধ, সম্পৃক্ত অপরাধ ও মানিলন্ডারিং অপরাধের যোগসূত্র ১৬
১.৬ আর্থিক অপরাধ সংঘটনের ধাপ ১৮
১.৭ আর্থিক ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১৯
১.৭.১ ব্যাংকিং/আর্থিক ব্যবস্থা ২০
১.৭.২ ব্যাংকিং/আর্থিক ব্যবস্থায় প্রদত্ত বিভিন্ন ধরনের সেবাসমূহ ২১
১.৭.৩ পরিশোধের বিভিন্ন পদ্ধতি ২২
১.৮ আর্থিক অপরাধ সংঘটনের কৌশল ২৭

০২ আর্থিক অপরাধ তদন্ত সম্পর্কিত সংস্থা, আইন ও আন্তর্জাতিক মানদন্ড ৩১

২.১ আর্থিক অপরাধ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক মানদন্ড ৩১
২.১.১ অবৈধ মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্য পাচার বিরোধী জাতিসংঘ কনভেনশন, ১৯৮৮ ৩১
২.১.২ এফএটিএফ সুপারিশমালা ৩২
২.১.৩ আন্তর্জাতিক সংঘবদ্ধ অপরাধ বিরোধী জাতিসংঘ কনভেনশন, ২০০০ ৩৪
২.১.৪ দুর্নীতি বিরোধী জাতিসংঘ কনভেনশন, ২০০৩ ৩৫
২.২ বাংলাদেশে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ৩৯
২.৩ আর্থিক অপরাধ বা মানিলন্ডারিং এর তদন্তকারী সংস্থা ৪১
২.৩.১ দুর্নীতি দমন কশিমন (দুদক) ৪৩
২.৩.২ অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি), বাংলাদেশ পুলিশ ৪৪
২.৩.৩ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR) ৪৪
২.৩.৪ কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর (CIID) ৪৪
২.৩.৫ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC) ৪৫
২.৩.৬ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ৪৫
২.৩.৭ পরিবেশ অধিদপ্তর ৪৬

০৩ আর্থিক অপরাধ অনুসন্ধান ও তদন্তের কৌশল ৪৯

৩.১ আর্থিক অপরাধ অনুসন্ধান ৪৯
৩.২ যাচাই-বাছাই পদ্ধতি ৫০
৩.২.১ ঝুঁকিভিত্তিক কেস যাচাই-বাছাই পদ্ধতির সুবিধা ৫০
৩.২.২ যাচাই-বাছাই কমিটি ৫০
৩.২.৩ স্কোর ভিত্তিক যাচাই-বাছাই পদ্ধতি ৫১
৩.৩ অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা ৫৩
৩.৩.১ অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তার জন্য লক্ষ্যনীয় বিষয়সমূহ ৫৬
৩.৩.২ অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল ও এজাহার দায়ের ৫৭
৩.৪ আর্থিক অপরাধ তদন্ত ৫৭
৩.৪.১ মানিলন্ডারিং বা আর্থিক অপরাধ তদন্তের উৎসসমূহ ৬০
৩.৪.২ তদন্তের কৌশল ও বিশেষ পদ্ধতিসমূহ ৬৫
৩.৪.২.১ আর্থিক বা মানি লন্ডারিং তদন্তের পরিকল্পনা করা ৬৫
৩.৪.৩ তথ্য, উপাত্ত ও প্রমাণ সংগ্রহের পদ্ধতি ৬৭
৩.৪.৩.১ আর্থিক বিশ্লেষণ ৬৭
৩.৪.৩.২ আর্থিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি ৬৭
৩.৪.৩.৩ আর্থিক সাক্ষাৎকার ৭০
৩.৪.৩.৪ সার্চ ওয়ারেন্ট ৭১
৩.৪.৩.৫ নজরদারি ৭১
৩.৪.৩.৬ ট্র্যাশ পিকআপ ৭২
৩.৪.৩.৭ ব্যাংক রেকর্ড বিশ্লেষণ ৭২
৩.৪.৩.৮ ফরেনসিক বিজ্ঞান ৭২
৩.৪.৩.৯ কম্পিউটার ফরেনসিক ৭৩
৩.৪.৩.১০ সম্মতিমূলক পর্যবেক্ষণ ৭৪
৩.৪.৩.১১ আন্ডারকভার অপারেশন ৭৪
৩.৪.৩.১২ তদন্তে সাক্ষাৎকার গ্রহণ ৭৪
৩.৪.৩.১৩ লিংক চার্টিং ৮২
৩.৪.৩.১৪ টেলিফোন কল বিশ্লেষণ ৮২
৩.৫ সম্পদ ক্রোক, জব্দ ও বাজেয়াপ্তকরণ ও সংরক্ষণ ৮৩
৩.৬ আর্থিক অপরাধ তদন্তে তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা ৮৫
৩.৭ ব্রিফিং ও উপস্থাপন ৮৬
৩.৮ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল ও চার্জশীট ৮৬
৩.৯ তদন্ত প্রতিবেদনের নমুনা ৮৭
৩.১০ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ৯৫
৩.১০.১ আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সুবিধা ৯৭
৩.১০.২ আন্তর্জাতিক সহযোগিতার শর্ত ৯৭
৩.১০.৩ Mutual Legal Assistance ৯৯

০৪ পাচারকৃত অর্থ পুনরুদ্ধারের কৌশল ১০৩

৪.১	ভুমিকা	১০৩
৪.২	অর্থপাচার সমস্যার স্বরূপ	১০৩
৪.৩	অর্থপাচারের কৌশলসমূহ	১০৫
৪.৪	অর্থ পাচার রোধ বা পাচারকৃত অর্থ পুনরুদ্ধারে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন বা মানদন্ডসমূহ	১০৮
	৪.৪.১ পাচারকৃত অর্থ পুনরুদ্ধারে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন বা মানদন্ডসমূহ	১০৯
	৪.৪.২ পাচারকৃত অর্থ পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত আন্ত:সংস্থা টাস্কফোর্স	১০৯
	৪.৪.৩ আনুষ্ঠানিক প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা	১১১
	৪.৪.৪ অনানুষ্ঠানিক প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা	১১২
৪.৫	পাচারকৃত অর্থ পুনরুদ্ধারের ধাপসমূহ	১১৩
	৪.৫.১ তথ্য প্রমান সংগ্রহ ও পাচারকৃত অর্থ সনাক্তকরণ	১১৪
	৪.৫.২ সনাক্তকৃত অর্থ সুরক্ষিতকরণ	১১৫
	৪.৫.৩ পাচারকৃত অর্থ পুনরুদ্ধারে আইনী প্রক্রিয়া শুরু	১১৬
	৪.৫.৪ আদালতের আদেশ কার্যকর	১১৭
	৪.৫.৫ পাচারকৃত অর্থ ফেরত	১১৮
৪.৬	পাচারকৃত অর্থ পুনরুদ্ধারের চ্যালেঞ্জসমূহ	১১৯
	৪.৬.১ টেকনিক্যাল চ্যালেঞ্জ	১১৯
	৪.৬.১.১ দক্ষতার অভাব	১১৯
	৪.৬.১.২ আর্থিক সংস্থানের অভাব	১১৯
	৪.৬.১.৩ MLA সম্পর্কিত দক্ষতার অভাব	১২০
	৪.৬.১.৪ ব্যাংক সিক্রেসী	১২০
	৪.৬.২ পলিটিক্যাল চ্যালেঞ্জ	১২০
	৪.৬.২.১ রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব	১২০
	৪.৬.২.২ দেশীয় স্বার্থের দ্বন্দ্ব	১২০
	৪.৬.২.৩ দুর্নীতি প্রতিরোধ সংস্থার অস্বচ্ছতা	১২১
	৪.৬.২.৪ পাচারকৃত অর্থের পুনরুদ্ধার রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার	১২১
	৪.৬.৩ পলিসি সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ	১২১
	৪.৬.৩.১ ভুরাজনৈতিক সম্পর্ক	১২১
	৪.৬.৩.২ দক্ষতা ও যথোপযুক্ততা	১২১
	৪.৬.৪ পাচারকৃত অর্থের পুনরুদ্ধারে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়	১২১
৪.৭	অর্থ পাচার রোধ ও পাচারকৃত অর্থ পুনরুদ্ধার: বাংলাদেশের জন্য সুপারিশ	১২২
	৪.৭.১ পাচারকৃত অর্থ পুনরুদ্ধারে মূল সমস্যা	১২২
	৪.৭.২ সমস্যা সমাধানের উপায়	১২৩
	৪.৭.৩ বাংলাদেশে কিভাবে MLA & Asset Recovery Unit. প্রতিষ্ঠা করা যায়?	১২৩
	৪.৭.৪ বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে কিভাবে দ্রুত পাচারকৃত অর্থ পুনরুদ্ধার করা যায়?	১২৫

০৫ সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিসমূহ ১২৬

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ ১২৬

অপরাধ সম্পর্কিত পারস্পরিক সহায়তা আইন, ২০১২ ১৫২

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে বিধিমালা, ২০১৯ ১৭৭

আরও জানার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বই ও রিসোর্স ২৩৬

অধ্যায় ০১

আর্থিক অপরাধ

১.১ ভূমিকা

বিংশ শতাব্দীর স্বনামধন্য ক্রিমিনোলোজিস্ট আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর জনাব এডউইন হারদিন সাদারল্যান্ড ১৯৩৯ সালে সর্বপ্রথম আর্থিক অপরাধ বিষয়টিকে সামনে এনে এটিকে হোয়াইট কলার ক্রাইম হিসেবে চিহ্নিত করেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন ও ক্রিমিনোলোজিস্ট আর্থিক অপরাধের বিষয়টিকে আরো পরিশীলিত রূপ দেয়ার চেষ্টা করেন। এরই ফলশ্রুতিতে ধীরে ধীরে আর্থিক অপরাধের ডোমেইনে মানিলন্ডারিং, প্রতারণা, ঘুষ, দুর্নীতি, কর ফাঁকি, সংঘবদ্ধ অপরাধ, ড্রাগ ডিলিং, মার্কেট ম্যানিপুলেশন, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন, অর্থ আত্মসাৎ ইত্যাদি যুক্ত হতে থাকে।

সংঘবদ্ধ অপরাধীগণ, বিশেষ করে মাদক পাচারকারীগণ, প্রচুর পরিমাণে নগদ অর্থ উৎপাদন করে এবং অবৈধ কর্মকাণ্ড হতে সর্বোচ্চ সুবিধা পেতে অপরাধীগণকে তাদের অবৈধ উপায়ে প্রাপ্ত সম্পদকে বৈধ রূপ দিতে থাকেন। এটিকে বলে মানিলন্ডারিং। ১৯৬০ এর দশকে সাধারণ মানুষ মানিলন্ডারিং বলতে বিদেশি ট্যাক্স হ্যাভেন এর দুর্নীতিপরায়ণ ব্যাংকারদের সাথে অস্পষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট অজানা বিষয়সমূহকে বুঝত। তারপর ১৯৮০ এর দশকে আর্থিক অপরাধ ও মানিলন্ডারিং সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করা হতে থাকে, যা বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে।

পরবর্তীতে বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগকারী এজেন্সিসমূহ, যারা আর্থিক অপরাধ বা মানিলন্ডারিং এর প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখেছে, তারা মানিলন্ডারিংকে নব্বইয়ের দশকের অপরাধ হিসেবে বর্ণনা করতে শুরু করে। তবে তখনও এটিকে বেশিরভাগ মানুষ প্রকৃত সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করেনি। কিন্তু এখন বিষয়টি আর আগের মত নেই; বর্তমান প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন।

আর্থিক অপরাধ

বর্তমানে মানিলন্ডারিং অত্যন্ত সমসাময়িক একটি অপরাধ এবং এটি আমাদের প্রত্যেককেই প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করছে। মানিলন্ডারিং হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাদক পাচারের জীবনীশক্তি এবং মাদক আমাদের এই অঞ্চলের জন্য সামাজিক ক্যান্সার রূপে আবির্ভূত হয়েছে। একইভাবে সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন সন্ত্রাসী ও সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর জীবনীশক্তি।

বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রকাশিত আর্থিক অপরাধের তথ্য, উপাত্ত ও বিশেষজ্ঞদের মতামত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আর্থিক অপরাধের ঝুঁকি ক্রমবর্ধমান হারে বেড়েই চলেছে। জাতিসংঘের Office On Drugs and Crimes (UNODC) এর তথ্যমতে বিশ্ব জিডিপি'র ২%-৫% অর্থ প্রতি বছর আর্থিক অপরাধ বা মানিলন্ডারিং করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে UNODC এর বিবেচনায় ২০২৪ সালের আর্থিক অপরাধ বা মানিলন্ডারিং এর পরিমাণ ছিলো ২.২২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ৫.৫৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ। অথচ UNODC এর ভাষ্যমতে বিশ্বের আর্থিক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রবাহিত এসব অপরাধমূলক অর্থের মাত্র ১% বা তারও কম ধরা পড়ে। আর্থিক ব্যবস্থায় ডিজিটালাইজেশন ও ক্রিপ্টোকারেন্সীর উত্থান ও এর ক্রমবর্ধমান ব্যবহার আর্থিক অপরাধ বা মানিলন্ডারিং এর পরিস্থিতিতে আরো উদ্বেগজনক পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে।

আর্থিক অপরাধকে মানিলন্ডারিং অপরাধ থেকে আলাদা করা কার্যত অসম্ভব কারণ প্রায় সকল আর্থিক অপরাধ থেকে অবৈধ আয় উৎসরিত হয় এবং সেগুলোকে বিভিন্ন উপায়ে বৈধতা দেয়া হয়, যা মানিলন্ডারিং অপরাধ হিসেবে বিবেচিত। অপরদিকে মানিলন্ডারিং নিজেই একটি আর্থিক অপরাধ। আর একারণেই আর্থিক অপরাধ তদন্তে মানিলন্ডারিং অপরাধ তদন্তের কৌশল বা পদ্ধতিসমূহ হুবহু ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

১.২ আর্থিক অপরাধ:

আর্থিক অপরাধ বলতে অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জিত হয় এমন সকল ধরনের অপরাধকে বোঝানো হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে কম-বেশি অর্থ উপার্জন করা যায় এমন সকল অপরাধই আর্থিক অপরাধের আওতাভুক্ত। তবে মোটা দাগে আর্থিক অপরাধের আওতাভুক্ত অপরাধগুলো নিম্নরূপ:

- মানিলন্ডারিং
- প্রতারণা
- ঘুষ
- দুর্নীতি
- কর ফাঁকি

অধ্যায় ০২

আর্থিক অপরাধ তদন্ত সম্পর্কিত সংস্থা, আইন ও আন্তর্জাতিক মানদন্ড

২.১ আর্থিক অপরাধ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক মানদণ্ড:

আর্থিক অপরাধ, মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নের বিরুদ্ধে জাতিসংঘসহ পৃথিবীর বিভিন্ন সংগঠন ও দেশ সোচ্চার অবস্থানে রয়েছে। এ ধরনের অপরাধ প্রতিরোধে পৃথিবীব্যাপী প্রতি বছর বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন সময়ে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন সংগঠন আর্থিক অপরাধ, মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নের বিষয়ে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড প্রণয়ন করেছে, যা বিশ্বের প্রতিটি দেশের জন্য অনুসরণীয়। এসব আন্তর্জাতিক মানদণ্ড সংক্ষেপে নিম্নে তুলে ধরা হলো:

২.১.১ অবৈধ মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্য পাচার বিরোধী জাতিসংঘ কনভেনশন, ১৯৮৮ (United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988)

আর্থিক অপরাধ বিষয়ে প্রথম আন্তর্জাতিক চুক্তি হলো অবৈধ মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্য পাচার বিরোধী জাতিসংঘ কনভেনশন, ১৯৮৮ (এটি ভিয়েনা কনভেনশন ১৯৮৮ নামেও পরিচিত)। ১৯৮০-র দশকের শেষ ভাগে বিশ্ব জুড়ে মাদক পাচার পরিচালনাকারী দ্রুত উত্থানশীল অর্থনৈতিক শক্তিসমূহের প্রেক্ষাপটে এটি ছিল মানিলন্ডারিং এর বিরুদ্ধে একটি বৈপ্লবিক ঘোষণা। যেহেতু এ সকল মাদক পাচারকারী গোষ্ঠীসমূহ আর্থিকভাবে অনেক শক্তিশালী ছিল, তারা পুরো অঞ্চলকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে তুলছিল এবং সাধারণ মানুষকে সন্ত্রাসের মাধ্যমে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছিলো বিধায় জাতিসংঘ আলোচ্য কনভেনশনালটি অনুমোদন করে। মানিলন্ডারিং সম্পর্কিত ভিয়েনা কনভেনশন ১৯৯৮ এর মূল ধারাসমূহের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

- এই কনভেনশন মাদক সম্পর্কিত মানিলন্ডারিং কে অপরাধ কর্মকাণ্ড হিসেবে চিহ্নিত করতে বাধ্য করেছে। (ধারা-৩.)
- এই কনভেনশনে মাদক সম্পর্কিত মানিলন্ডারিং হতে অর্জিত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার তাগিদ দেয়া হয়েছে (ধারা ৫)।কনভেনশন সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে বাজেয়াপ্ত সম্পদের অংশবিশেষ অবৈধ মাদক ও নেশা জাতীয় দ্রব্যসমূহের পাচার এবং

এর অপব্যবহার রোধে বিশেষায়িত আন্ত: সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদান করতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

- মানিলন্ডারিং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বহিঃসমর্পণযোগ্য অপরাধ (Eextraditable Crime) হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে যদিও বহিঃসমর্পণের বিষয়টি কতিপয় শর্তাধীন। এ সকল শর্তের মধ্যে রয়েছে দ্বিপাক্ষিক বহিঃসমর্পণ চুক্তি থাকবে। যদি কোনো রাষ্ট্রের বহিঃসমর্পণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার বাধা থাকে তাহলে কনভেনশন অনুযায়ী উক্ত রাষ্ট্র কথিত অপরাধীর বিচার বহিঃসমর্পণের জন্য অনুরোধকারী রাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী হতে হবে (ধারা ৬)।
- সকল প্রকার বে-আইনি অর্থ প্রবাহ রোধে পারস্পরিক আইনি সহযোগিতা করতে হবে (ধারা ৭)
- সকল কনভেনশন অনুযায়ী ব্যাংক বিষয়ক গোপনীয়তার অজুহাতে সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকা যাবে না।
- ১৯৮৮ ভিয়েনা কনভেনশন বর্তমানে সর্বজনীনভাবে পালিত হচ্ছে (জুলাই ২০১০ সালের হিসেব অনুযায়ী ১৮৪ টি রাষ্ট্র) এবং এটি অনেক দেশে মানিলন্ডারিং বিরোধী আইন প্রণয়নের ভিত্তি গড়ে দিয়েছে।

২.১.২ এফএটিএফ সুপারিশমালা

১৯৮৯ সালে জি-৭ গ্রুপের প্যারিস অর্থনৈতিক শীর্ষ সম্মেলনে ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্টের উপস্থিতিতে ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি উদ্যোগ গ্রহণের প্রস্তাব দেয় ; যার ফলে শেষ পর্যন্ত ফিন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (FATF) নামে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে একটি নতুন আন্তঃসরকার প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। এই প্রতিষ্ঠানটির জন্ম হয়েছিল মূলত মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে একটি আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করা ও বিশ্বব্যাপী অপরাধীদের দ্বারা আর্থিক ব্যবস্থার অপব্যবহার রোধে আইন ও শাসন ব্যবস্থার সংস্কার আনয়নে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সদিচ্ছা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে।

১৯৯০ সালে FATF চল্লিশ সুপারিশমালা' ঘোষণা করে; যা ১৯৮৮ ভিয়েনা কনভেনশণ স্বাক্ষর ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি সাধারণ মানিলন্ডারিং বিরোধী ফ্রেমওয়ার্ক প্রদান করে এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধের ক্ষেত্রকে মাদক পাচার থেকে অন্যান্য সকল প্রকার গুরুতর অপরাধ পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়। পরবর্তীতে FATF এর চল্লিশ সুপারিশমালা পুনরায় ২০১২ সালে সংশোধন করা হয়।

FATF এর মূল সুপারিশসমূহ হলো:

- সুপারিশ ৩ অনুযায়ী যে সকল মানিলন্ডারিং কর্মকাণ্ড সর্বনিম্ন ৬ মাসের কারাদণ্ড ও সর্বোচ্চ ১ বছরের অধিক কারাদণ্ড প্রদান যোগ্য অপরাধের (অবশ্য কোনো দেশ

অধ্যায় ০৩

আর্থিক অপরাধ অনুসন্ধান ও তদন্তের কৌশল

আর্থিক অপরাধ বা মানিলন্ডারিং অপরাধ তদন্ত কার্যক্রম মূলত দুইটি ধাপে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এর প্রথম ধাপ হলো অনুসন্ধান ও দ্বিতীয় ধাপ হলো তদন্ত। এ অধ্যায়ে আর্থিক অপরাধ বা মানিলন্ডারিং অনুসন্ধান ও তদন্ত সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হবে।

৩.১ আর্থিক অপরাধ অনুসন্ধান:

আর্থিক অপরাধ বা মানি লন্ডারিং অপরাধ তদন্তের প্রথম ধাপ হলো অনুসন্ধান কার্যক্রম। আর অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু হয় বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা অনুসারে নিয়মিত মামলা বা এজাহার রুজুর পূর্বে বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত অভিযোগ, বা অপরাধের তথ্য-উপাত্ত, বা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইউনিট হতে প্রাপ্ত গোয়েন্দা প্রতিবেদনের প্রাথমিক সত্যতা যাচাই বা সঠিকতা নিরূপণের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাদিকে অনুসন্ধান বলা হয়। এ হিসেবে অনুসন্ধানও এক ধরনের তদন্ত কার্যক্রম, যাকে প্রাথমিক তদন্ত বা Prima Facie Investigation নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। অনুসন্ধানের শুরু হয় আর্থিক অপরাধের তথ্য-উপাত্ত আইন প্রয়োগকারী/তদন্তকারী সংস্থার হাতে পৌঁছানোর পর। এক্ষেত্রে যেসব উৎস থেকে তদন্তকারী সংস্থা আর্থিক অপরাধের তথ্য-উপাত্ত পেয়ে থাকে, সেগুলো মোটা দাগে নিম্নরূপ:

ক) অভিযোগ
খ) মিডিয়া রিপোর্ট
গ) তথ্যদাতা
ঘ) বিভিন্ন সরকারি সংস্থার রিপোর্ট
ঙ) বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট
চ) বিএফআইইউ এর আর্থিক গোয়েন্দা প্রতিবেদন ইত্যাদি।

৩.২ যাচাই-বাছাই পদ্ধতি

আবার উপরোক্ত তথ্য উপাত্ত পাওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু হয়ে যায় না। সকল অভিযোগের প্রাথমিক তদন্ত করার মতো সময় ও জনবল বিষয়ক স্বল্পতা সব তদন্তকারী সংস্থায় রয়েছে বিধায় বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাচাই-বাছাই করে কেবলমাত্র চূড়ান্তভাবে বাছাইকৃত অভিযোগসমূহ তদন্তকারী সংস্থাগুলো অনুসন্ধান করে থাকে। দুর্নীতি দমন কমিশন, সিআইডি সহ অন্যান্য তদন্তকারী সংস্থাসমূহ আর্থিক অপরাধ বা মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত অভিযোগ প্রাপ্ত হয়ে থাকে, যা মূলত অনুসন্ধানের একটি অন্যতম উৎস। প্রতিটি তদন্তকারী সংস্থা রিসোর্স এর সীমাবদ্ধতার কারণে যাচাই-বাছাইপূর্বক মেরিট আছে এমন অভিযোগ বা কেসসমূহ অনুসন্ধান করে থাকে। এ বিষয়ে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা ২০১৯ এর বিধি নম্বর ৪৪-৪৮ এ আর্থিক অপরাধ এর অভিযোগ বা তথ্য উপাত্ত যাচাই-বাছাই এর নিমিত্তে যাচাই-বাছাই কমিটি, পদ্ধতি, সময়সীমা ইত্যাদির উল্লেখ থাকলেও উক্ত কার্যক্রম কীভাবে সম্পন্ন করা হবে এ বিষয়ে বিশদভাবে কিছু বলা হয়নি। উল্লেখ্য, পৃথিবীব্যাপী অনুসন্ধানের নিমিত্তে আলোচ্য যাচাই-বাছাই কার্যক্রম "ঝুঁকিভিত্তিক কেস যাচাই-বাছাই পদ্ধতি" নামে পরিচিত। এজন্য আর্থিক অপরাধ তদন্তকারী প্রতিটি সংস্থায় একটি ও উক্ত যাচাই-বাছাই এর নিমিত্তে একটি বিজ্ঞানসম্মত বা ঝুঁকিভিত্তিক কেস যাচাই-বাছাই পদ্ধতি থাকা উচিত।

৩.২.১ ঝুঁকিভিত্তিক কেস যাচাই-বাছাই পদ্ধতির সুবিধা:

ক) তদন্তকারী সংস্থার সকল প্রকার রিসোর্সের উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়

খ) অপেক্ষাকৃত বড় বড় আর্থিক অপরাধ সংক্রান্ত কেসে উপযুক্ত জনবলের ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়; এবং

গ) অনুসন্ধানের জন্য গৃহীত বাদেও সকল কেসসমূহ একটি আর্কাইভে সংরক্ষণের (ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য) ব্যবস্থা সম্ভব হয়।

৩.২.২ যাচাই-বাছাই কমিটি

একটি যাচাই-বাছাই কমিটি সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী সংস্থার বিভিন্ন উইং এর কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকে। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা ২০১৯ এ ০৩ জন সদস্যের সমন্বয়ে আলোচ্য কমিটি গঠন করতে বলা হয়েছে। তবে বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থার অর্গানোগ্রাম বিবেচনাপূর্বক ০৩ সদস্য বিশিষ্ট যাচই-বাছাই কমিটি গঠন কিছুটা কঠিন। এক্ষেত্রে একটি যাচাই-বাছাই কমিটি অন্যূন নিম্নরূপে গঠিত হওয়া উচিত:

ক) মহাপরিচালক/পরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তা, প্রশাসন বিভাগ----------- আহ্বায়ক

খ) বিভিন্ন তদন্তকারী উইং এর উপযুক্ত প্রতিনিধি--------- সদস্য

গ) আইন বিভাগ/উইং এর উপযুক্ত প্রতিনিধি--------- সদস্য

E. Contact Information for Follow-Up:

Should you require any further information or clarification regarding this request, please do not hesitate to contact me at [phone number] or [email address]. We are happy to work closely with the appropriate authorities in Bangladesh to facilitate this process.

Thank you for your attention to this matter. We look forward to your positive response and cooperation.
Yours sincerely,
[Your Name]
[Your Title/Position]
[Your Office/Agency Name]

অধ্যায় ০৪

পাচারকৃত অর্থ পুনরুদ্ধারের কৌশল

৪.১ ভূমিকা

অর্থ পাচার পৃথিবীর একটি সামগ্রিক সমস্যা। এক্ষেত্রে কোনো দেশ সোর্স এবং কোনো দেশ ডেসটিনেশন হিসেবে পরিচিত। সাধারণতঃ পৃথিবীর অনুন্নত বা উন্নয়শীল দেশ হতে উন্নত দেশ (সিংগাপুর, সংযুক্ত আরব আমিরাত, হংকং, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ইত্যাদি) বা অফশোর হেভেন অর্থাৎ যেসব দেশে কোম্পানির ট্যাক্স জিরো এবং সহজেই কাগুজে কোম্পানি খোলা যায় (যেমনঃ ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড, কেম্যান আইল্যান্ড, মরিশাস, ক্যারিবিয়ান আইল্যান্ডস ইত্যাদি) এমন দেশগুলোতে অর্থপাচারের ঘটনা ঘটে থাকে। এক্ষেত্রে যেসব দেশ হতে অর্থপাচার হয় সেসব দেশকে সোর্স দেশ এবং যেসব দেশে পাচারকৃত অর্থ ল্যান্ড করে সেসব দেশকে ডেসটিনেশন দেশ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। পৃথিবীর মানচিত্রে ছোট্ট একটি দেশ, বাংলাদেশ অর্থপাচারের জন্য একটি চিহ্নিত সোর্স দেশ। অর্থপাচার যেমন পৃথিবীর সামগ্রিক সমস্যা তেমনি এককভাবে বাংলাদেশের জন্যেও এটি একটি বিরাট সমস্যা। এছাড়াও পাচারকৃত অর্থ পুনরুদ্ধারে পৃথিবীর কিছু কিছু দেশ কিছু সাফল্য অর্জন করলেও বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

অর্থপাচারের সামগ্রিক এই সমস্যার বিষয়টি মাথায় রেখেই জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ১৬.৪ এ ২০৩০ সালের মধ্যে প্রতিটি দেশের জন্য অবৈধ উপায়ে উৎসারিত অর্থের প্রবাহ প্রাক্কলন করা, সংঘবদ্ধ অপরাধ প্রতিহত করা ও পাচারকৃত অর্থের পুনরুদ্ধারে সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে। বাংলাদেশও উক্ত লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখে শুধুমাত্র ড্রাগ রিলেটেড অর্থের প্রবাহ প্রাক্কলন করার নিমিত্তে UNODC (United nations Office on Drugs and Crime) এর সাথে কাজ করছে তবে অন্যান্য সংঘবদ্ধ অপরাধ বা ট্রেড মিস ইনভয়েসিং এর মাধ্যমে অর্থপাচার সংক্রান্ত কোনো প্রাক্কলনের উদ্যোগ এখনো গ্রহণ করা হয়নি।

৪.২ অর্থ পাচার সমস্যার স্বরূপ

বিভিন্ন সংস্থার গবেষণায় অর্থ পাচারের পরিমাণের বিভিন্ন ধরনের প্রাক্কলন উঠে এসেছে। তবে অর্থপাচারের প্রাক্কলনের আলোচনার আগে এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অর্থ পাচারের ক্ষতির পরিমাণসাধারণত প্রাক্কলনেরও কয়েকগুণ বেশী হয়ে থাকে। কেননা অর্থ

পাচারের ফলে শুধু দেশ হতে বিদেশে একটি নির্দিষ্ট অর্থের প্রবাহই ঘটে না বরং ঐ নির্দিষ্ট দেশের পাবলিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সুশাসনের কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে, আর্থিক খাতের সুশাসন ও ম্যানেজমেন্ট ভঙ্গুর হয়ে পড়ে; যা আবার প্রাইভেট বিনিয়োগের পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং সামাজিক সেবা প্রদানের ম্যাকানিজম বিশেষত স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ইত্যাদির রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতির অনুপ্রবেশ ঘটে বিধায় সামগ্রিক অর্থনীতিতে একটা কোলাটেরাল ড্যামেজ (Collateral Damage) ঘটে থাকে। বিভিন্ন গবেষণায় অর্থ পাচারের যে তথ্যাবলি উঠে এসেছে তা নিম্নরূপ:

- ক্যামডেসাস এর গবেষণায় (১৯৯৮) পাচারকৃত অর্থের পরিমাণ বিশ্ব জিডিপি'র ২%-৫% এবং সে হিসেবে ৮০০ বিলিয়ন হতে ২ ট্রিলিয়ন ডলার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে
- রয়টার্সের গবেষণায় (২০০৪) পাচারকৃত অর্থের পরিমাণ৩.৪ ট্রিলিয়ন ডলার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে
- ইউফোর এর গবেষণায় (২০০৭) এ বলা হয়েছে আফ্রিকান দেশগুলো হতে পাচারকৃত অর্থের পরিমাণ সর্বমোট আফ্রিকান অর্থনীতির ২৫%।
- গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ট্রেগ্রিটি এর গবেষণায় (২০১২) বিশ্বব্যাপী অর্থ পাচারের পরিমাণ ৭.৮ ট্রিলিয়ন ডলার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে
- গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ট্রেগ্রিটি এর গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিশ্বব্যাপী প্রতিবছর গড়ে ৬.৫% হারে অর্থ পাচারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে

পৃথিবীর অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো অর্থ পাচার বাংলাদেশের একটি অন্যতম সমস্যা। বাংলাদেশ মূলত: অর্থপাচারের উৎস (সোর্স) দেশ হলেও অর্থ পাচারে শীর্ষ ১০ টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশ নেই। অর্থ পাচারে শীর্ষ ১০ টি দেশ হলো চীন (১.৩৯ ট্রিলিয়ন ডলার), রাশিয়া (১.০৫ ট্রিলিয়ন ডলার), মেক্সিকো (৫২৪ বিলিয়ন ডলার), ভারত (৫১০ বিলিয়ন ডলার), মালয়েশিয়া (৪১৮ বিলিয়ন ডলার), ব্রাজিল (২২৬ বিলিয়ন ডলার), ইন্দোনেশিয়া (১৮১ বিলিয়ন ডলার) এবং নাইজেরিয়া (১৭৮ বিলিয়ন ডলার)। Global Financial Integrity (GFI) রিপোর্ট অনুসারে বাংলাদেশ শীর্ষ ৩০ টি দেশের তালিকায় রয়েছে এবং প্রতি বছর গড়ে ৮.২৭ বিলিয়ন পাচার হয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ডেসটিনেশন দেশ হিসেবে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সিংগাপুর, হংকং, সুইজারল্যান্ড ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

অর্থ পাচারের ফলে একটি দেশের অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়। এর মধ্যে অন্যতম ক্ষতিকর দিক হলো একটি দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। একটি গবেষণায় উঠে এসেছে যে, প্রতি ১০০ মিলিয়ন ডলার কোনো দেশ থেকে পাচার না হলে, উক্ত পরিমাণ অর্থ দিয়ে অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে নিম্নলিখিত কাজগুলো করা সম্ভব:

অধ্যায় ০৫

সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিসমূহ

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২
(২০১২ সনের ৫ নং আইন)
[ফেব্রুয়ারি ২০, ২০১২]

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন ও অধ্যাদেশ রহিতক্রমে এতদ্‌সংক্রান্ত আইন পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু মানিলন্ডারিং ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অপরাধ প্রতিরোধ এবং উহাদের শাস্তির বিধানসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন ও অধ্যাদেশ রহিতক্রমে এতদ্‌সংক্রান্ত আইন পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

(১) এই আইন মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ৩ মাঘ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ/১৬ জানুয়ারি, ২০১২ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২ । সংজ্ঞা

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) ''অর্থ বা সম্পত্তি পাচার'' অর্থ-

(১) দেশে বিদ্যমান আইনের ব্যত্যয় ঘটাইয়া দেশের বাহিরে অর্থ বা সম্পত্তি প্রেরণ বা রক্ষণ; বা

(২) দেশের বাহিরে যে অর্থ বা সম্পত্তিতে বাংলাদেশের স্বার্থ রহিয়াছে যাহা বাংলাদেশে আনয়ন যোগ্য ছিল তাহা বাংলাদেশে আনয়ন হইতে বিরত থাকা; বা

(৩) বিদেশ হইতে প্রকৃত পাওনা দেশে আনয়ন না করা বা বিদেশে প্রকৃত দেনার অতিরিক্ত পরিশোধ করা;

(খ) ''অর্থ মূল্য স্থানান্তরকারী'' অর্থ এমন আর্থিক সেবা যেখানে সেবা প্রদানকারী একস্থানে নগদ টাকা, চেক, অন্যান্য আর্থিক ইন্সট্রুমেন্ট (ইলেকট্রনিক বা অন্যবিধ) গ্রহণ করে এবং অন্যস্থানে সুবিধাভোগীকে নগদ টাকা বা আর্থিক ইন্সট্রুমেন্ট বা অন্য কোনোভাবে সমপরিমাণ মূল্য প্রদান করে;

(গ) ''অপরাধলব্ধ আয়'' অর্থ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত অপরাধ হইতে অর্জিত, উদ্ভূত সম্পত্তি বা কারো আয়ত্তাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন এ ধরনের সম্পত্তি;

(ঘ) ''অবরুদ্ধ'' অর্থ এই আইনের আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো সম্পত্তি অস্থায়ী ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা আদালতের নিয়ন্ত্রণে আনয়ন করা যাহা আদালত কর্তৃক বাজেয়াপ্তকরণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হইবে;

(ঙ) ''অলাভজনক সংস্থা/প্রতিষ্ঠান (Non-Profit Organisation)' অর্থ কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ২৮ এর অধীন সনদপ্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠান;

(চ) ''আর্থিক ইন্সট্রুমেন্ট'' অর্থ সকল কাগুজে বা ইলেকট্রনিক দলিলাদি যাহার আর্থিক মূল্য রহিয়াছে;

(ছ) ''আর্থিক প্রতিষ্ঠান'' অর্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এর ধারা ২(খ) এ সংজ্ঞায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান;

(জ) ''আদালত'' অর্থ স্পেশাল জজ এর আদালত;

(ঝ) ''ক্রোক'' অর্থ এই আইনের আওতায় আদালত কর্তৃক কোনো সম্পত্তি অস্থায়ী ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা আদালতের জিম্মায় আনয়ন করা যাহা আদালত কর্তৃক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হইবে;

(ঞ) ''গ্রাহক'' অর্থ [১][বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট] কর্তৃক সময় সময় সংজ্ঞায়িত কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ অথবা সত্তা বা সত্তাসমূহ;

(ট) ''ট্রাস্ট ও কোম্পানি সেবা প্রদানকারী'' অর্থ কোনো ব্যক্তি বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যাহা অন্য কোনো আইনে সংজ্ঞায়িত করা হয় নাই এবং যে বা যাহা কোনো তৃতীয় পক্ষকে নিম্নবর্ণিত যে কোনো সেবা প্রদান করিয়া থাকেঃ

(১) কোনো আইনি সত্তা প্রতিষ্ঠার এজেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন,

(২) কোনো আইনি সত্তার পরিচালক, সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন বা অন্য কাহাকেও নিয়োগ করা বা অংশীদারি ব্যবসায়ে

(ক) গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক -সভাপতি;
(খ) সচিব/অতিরিক্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান
বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় -সদস্য;
(গ) সচিব/অতিরিক্ত সচিব, লেজিসলেটিভ ও
সংসদ বিষয়ক বিভাগ,
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় -সদস্য;
(ঘ) গভর্নর কর্তৃক মনোনীত আর্থিক খাতের
একজন বিশেষজ্ঞ -সদস্য;
(ঙ) গভর্নর কর্তৃক মনোনীত সাইবার সিকিউরিটি
বিষয়ক একজন বিশেষজ্ঞ -সদস্য;

৮) গভর্নর কর্তৃক মনোনীত আর্থিক খাতের বিশেষজ্ঞ ও সাইবার সিকিউরিটি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কোনো রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার মালিক বা সুবিধাভোগী কোনো কর্মকর্তা হইবেন না।
৯) বাছাই কমিটি উপস্থিত সদস্যদের অন্যূন ৩ (তিন) জনের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে অনধিক ৩ (তিন) জনের নামের একটি তালিকা প্রণয়ন করিয়া নিয়োগ প্রদানের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবে।
১০) বিএফআইইউ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

২৩। বিএফআইইউ এর প্রধান কর্মকর্তা হইবার যোগ্যতা, অযোগ্যতা ইত্যাদি।—
(১) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত কার্যক্রমে ৩ (তিন) বৎসরের অভিজ্ঞতার অগ্রাধিকারসহ-
(ক)সরকারের অর্থ বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত কার্যক্রমে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ প্রশাসনিক কার্যক্রমে সর্বমোট অন্যূন ২০ (বিশ) বৎসরের অভিজ্ঞতা; বা
(খ)কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যক্রমে সর্বমোট অন্যূন ২০ (বিশ) বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বাংলাদেশের কোনো নাগরিক বিএফআইইউ এর প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগের যোগ্য হইবেন।

(২) কোনো ব্যক্তি প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগের অযোগ্য হইবেন, যদি তিনি-
(ক) নৈতিক স্খলন বা ফৌজদারি কোনো অপরাধের দায়ে উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হন;
(খ)আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দেউলিয়াত্বের দায় হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত না হন;

ফরম-২
[বিধি ২৯ উপ-বিধি (১) দ্রষ্টব্য]
বিএফআইইউ এর গোয়েন্দা প্রতিবেদন

তারিখ:-------

১। সন্দেহজনক ব্যক্তি বা সত্তার বিস্তারিত বিবরণ
নাম: --
ঠিকানা: --

২। পিতার নাম: ---
৩। মাতার নাম: ---
৪। সন্দেহজনক ব্যক্তি বা সত্তার সহিত সম্পর্কিত ব্যক্তি বা সত্তার বিস্তারিত বিবরণ: --
----
----
৫ বিশ্লেষিত তথ্য বা দলিল (উৎসসহ): ---------------------------------------
----
৬। সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা (যদি থাকে):------------------------------
----
৭। সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা সংস্থা (যদি থাকে):-------------------
----
৮। কেইসটির সংক্ষিপ্তসার: ---

৯। ভবিষ্যৎ তদন্তের জন্য ইঙ্গিত: ---

১০। সহায়ক দলিলাদির তালিকা: ---

বিএফআইইউ
-এর
গোল সিল

ফরম-৩

[বিধি ২৯ উপ-বিধি (৩) দ্রষ্টব্য]

আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক হিসাব অবরুদ্ধকরণ বা স্থগিতকরণের অনুরোধপত্র

তারিখ------------

১। সন্দেহজনক ব্যক্তি বা সত্তার নাম --
ঠিকানা --

পিতার নাম: ---
মাতার নাম: ---
হিসাব নং: --

যে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান/শেয়ার বাজারের মধ্যস্থতাকারী, ইত্যাদিতে রক্ষিত হিসাব অবরুদ্ধ বা স্থগিত করা হইতেছে: --
----

মামলার তদন্ত/অনুসন্ধানের অবস্থা: -------------------------------------
বর্তমান অবরুদ্ধকরণ বা স্থগিতকরণ আদেশের (যদি থাকে) মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ:---
----
অবরুদ্ধকরণ বা স্থগিতকরণের প্রার্থিত সময়কাল: ------------------------------
২। মানিলন্ডারিং (সম্পৃক্ত অপরাধসহ) ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন সন্দেহের সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিত কারণ (যদি কেইসটি নিজস্ব উদ্যোগে গৃহীত হয়):

[দ্রষ্টব্য: চলমান আদেশ মেয়াদোত্তীর্ণের অন্তত ০৭ (সাত) কর্মদিবস পূর্বে অনুরোধপত্র বিএফআইইউ বরাবরে দাখিল করিতে হইবে]

স্বাক্ষর:
নাম:
পদবি:
ফোন:
তদন্তকারী সংস্থার নাম:
ই-মেইল: